এই পথ চলা

শুজা রশীদ

১৪ - কনে দেখা

১৯৯৬। মিশিগান থেকে মাস্টার্স শেষ করে চাকরি পেলাম নসুয়াতে। নিউ হ্যাম্পশায়ারের ছোট একটা শহর। মানি ম্যাগাজিনের বার্ষিক সার্ভেতে এটিই একমাত্র শহর যা দু' বার আমেরিকার সবচেয়ে বসবাসযোগ্য শহর হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল। বিশেষ চাকুরী ভিসা H1B নিয়ে কাজ করি। যে কম্পানীতে কাজ করি তারা বেতন ভালো দেয় না। কাজ পালটে ফেললাম। এক ভারতীয় কন্সাল্টিং কম্পানীতে গিয়ে যোগ দিলাম। প্রথম কন্ট্রাক্ট মিশিগানের মার্লবোরোতে – বিশাল এক ফাইনান্সিয়াল কম্পানীতে। মাস আটেক পর সেখানকার কন্ট্রাক্ট শেষ হতে আমার সামনে দুটি সুযোগ এলো। একটি স্থানীয়, অন্যটি ওয়াশিংটন স্টেটে অবস্থিত স্পোকেন নামক শহরে। আমি ব্যাচেলর, বাবা মা দেশে থাকেন। কোন বাঁধন নেই। বন্ধু বান্ধব যা আছে তা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নই। নতুন কোথাও গেলে নতুন বন্ধু জোটাতে হবে। কিন্তু দূরে কোথাও যাবার সুযোগ পেলে সেই সুযোগ কেন হারাব? মিশিগান হচ্ছে আমেরিকার পূর্ব প্রান্তে, ওয়াশিংটন পশ্চিম প্রান্তে, মাঝখানে তিন হাজার মাইল। ফ্লাই করতে চাই না। উচ্চতা ভীতি আছে, কিন্তু তার চেয়েও বড় – ড্রাইভ করে ঘুরতে অসম্ভব পছন্দ করি। আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ড্রাইভ করে যাবার ব্যাপারটা খুব মনে ধরল। দেশে বাবা মাকে বলতে তারা প্রথমে বেশ একটু ঘাবড়ে গেলেন। পরে কোন এক বিশেষ কারণে তাদের আগ্রহে অকস্মাৎ জোয়ার উঠল। যাত্রা শুরুর দিন দুয়েক আগে রহস্য ফাঁস করল মা। *সেই গাড়ী চালিয়েই যখন যাবি তখন একটু ঘুরে গিয়ে একজনের সাথে একটু দেখা করে যা।* বয়েস ত্রিশ পেরিয়ে গেছে। পড়াশূনা আর জীবিকা নিয়েই ব্যাস্ত ছিলাম এখানে আসা অবধি। অফিসের কাজের বাইরে বন্ধু বান্ধব কিছু থাকলেও

আসলে বেশ নিঃসঙ্গতাতেই ভুগি। প্রস্তাবটা খুব মন্দ লাগল না। কার সাথে কোথায় দেখা হয়ে যায় কে বলতে পারে। হিসাব করে দেখলাম ইন্টারস্টেট ৯০ ধরে মিনেসোটার ভেতর দিয়েই যাবো, একটু উত্তরে গিয়ে মিনিয়াপোলিস শহরে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটায় গিয়ে কারো সাথে দেখা করাটা খুব কঠিন কাজ হবে না। সব মিলিয়ে হয়ত ঘন্টা চারেক যাবে। কিন্তু সব দিক দিয়ে চিন্তা করলে এই সুযোগ হারানোটা ঠিক হবে না। বাবা আমাকে নাম, ঠিকানা জানিয়ে দিলেন। মেয়েটি আলাদা বাসা ভাড়া করে থাকে ইউনিভার্সিটির কাছেই। তার কোন ছবি দেয়া হয় নি। দেখা তো হবেই, ছবি নিয়ে মাথা ঘামানোর কি প্রয়োজন। আমার আগমনের বার্তা মেয়েটিকে দেয়া হয়েছে এবং সে বিশেষ দিনে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। জীবনে এটাই প্রথম কনে দেখা। বুকের মধ্যে কিঞ্চিৎ ধুক পুক করতে থাকল। বেইজ্জতী না হলেই হয়।

মার্লবোরোতে বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার টয়োটা করল্লাতে সাংসারিক যাবতীয় জিনিষপত্র ভরে এক সকালে রওনা দিলাম। ভেবেছিলাম মালপত্র তেমন নেই কিন্তু গাড়ীতে তুলতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, এটা সেটা মিলিয়ে যথেষ্টই আছে। গাদা গাদি করে কোন রকমে ভেতরে স্থান সংকুলান হল কিন্তু ড্রাইভারের আসন ব্যাতিরেকে আর কোন স্থান ফাঁকা রাখা গেল না। প্যাসেঞ্জার সীট আমার কম্পিউটার এবং মনিটর সহ খেলাধুলার নানান সাজ সরঞ্জামে এমনভাবে ভরে গেছে যে ওদিকের দরজা খোলারও কোন উপায় নেই।

প্রথম রাত কাটালাম পেনসিলভ্যানিয়ার এক শহরে। গরমকাল। রাত নটা দশটা পর্যন্ত দিনের আলো থাকে। আগে থেকে মোটেল ঠিক করে রেখে আটকে পড়তে চাই নি। সন্ধ্যার দিকে এক শহরে থেমে একটু খুঁজতেই সস্তা মোটেল পেয়ে গেলাম। পর দিন খুব ভোরে উঠে আবার যাত্রা শুরু। ইচ্ছা একেবারে মিনিয়াপোলিসে গিয়ে রাতের জন্য আস্তানা গাড়া। তাহলে পরদিন সকালে ঝট করে উঠে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে মেয়েটির সাথে দেখা করা যাবে।

বিশাল দেশ আমেরিকা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস মানুষের। বিশেষ করে বড় বড় শহর পেরিয়ে গেলে কোথাও কোথাও অনেক দূর পর্যন্ত কোথাও কিছু নেই, শুধু পিচ ঢালা রাস্তা চলে গেছে যতদূর নজর চলে। ফাঁকা রাস্তা এবং অপ্রতুল পুলিশ দেখে মনের সুখে গাড়ী চালিয়ে দিলাম। গাড়ী একটু পুরানো

হলেও তার তাকদ মন্দ নয়। অধিকাংশ পথ প্রায় ঘণ্টায় একশ' মাইল চালিয়ে গেলাম। তারপরও মিনিয়াপোলিস পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আগেই মোটেল ঠিক করে রেখেছিলাম। কোন ঝুঁকি নিতে চাই নি। মিনিয়াপোলিস বড় শহর, ইউনিভার্সিটি শহর। ভীড় ভাট্টা থাকতে পারে। বাবা বলে দিয়েছিলেন আগের দিন ফোন করে দেখা করার সময় ঠিক ঠাক করে নিতে। রাতে মোটেল থেকে ফোন দিলাম। যার সাথে কথা হল তার কণ্ঠ চমৎকার। পর দিন সকাল দশটার দিকে সাক্ষাতের সময় স্থির করে আমরা বিদায় নিলাম। অন্য কথাবার্তা তেমন কিছু হল না।
রাতে খুব একটা ভালো ঘুম হল না। একটু অস্থিরতা অনুভব করছি। দেশ ছেড়েছি প্রায় সারে চার বছর হল। বাংলাদেশী কোন তরুণীর সাথে বহুদিন দেখাই হয় নি। যে ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম সেখানে আমি ব্যাতিরেকে মাত্র আরেক জন বাংলাদেশী ছেলে ছিল। ভয় হচ্ছে, উদ্ভট কিছু করে সবাইকে বিব্রত না করি। কথা বার্তায় কখনই তেমন দক্ষ ছিলাম না।
পরদিন সকালে উঠেই ছুটলাম ফুলের দোকান খুঁজতে। এই শহরে একেবারেই নতুন। কোথায় কি কিছুই জানি না। মানুষ জনকে জিজ্ঞেস করে শেষ পর্যন্ত ফুলের দোকানের সন্ধান পাওয়া গেল। বিশাল এক তোড়া কিনে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আগে থেকে ম্যাপ দেখে এসেছিলাম কিন্তু তারপরও স্বভাব মত পথ ঘাট হারিয়ে আধা ঘন্টা এদিক সেদিক চক্কর দিয়ে শেষ পর্যন্ত জায়গা মত পৌঁছানো গেল। সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা এপার্টমেন্ট বিল্ডিং। অধিকাংশ অধিবাসীরাই মনে হল ছাত্র ছাত্রী, বই খাতা নিয়ে ছোটাছুটি করছে। গাড়ী পার্ক করে সাহসে বুক বেঁধে বাসা খুঁজতে লাগলাম। পাওয়া গেল। কলিং বেল বাজাতে একটি অল্প বয়স্ক, মিষ্টি চেহারার মেয়ে দরজা খুলে দিল। তার সহজ ভাব দেখে আমার ভয়টা একটু কাটল। নিজের পরিচয় দিলাম। "জিনিয়া বাসায় আছে?"
মেয়েটা ফিক করে হেসে দিল। ইংরেজীতে বলল, "ভেতরে এসো। আমিই জিনিয়া।"
কি করব ভাবছি। হাত বাড়িয়ে দেব? মেয়টা কি হ্যান্ডশেক করবে? বাংলাদেশী মেয়েরা কি হাত মেলায়? জিনিয়ার পেছনে লম্বা, ফর্সা আরেকটা মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, বড় সড় গড়ন বিধায় তাকে জিনিয়ার চেয়ে বয়েসে কিছু বড়ই মনে হল। মেয়েটি গম্ভীর মুখে আমাকে কয়েক মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করে বাংলায় বলল, "আপনিই কি জিনিয়ার সাথে দেখা করতে এসেছেন?"

নীরবে মাথা নাড়লাম। "আমি জিনিয়ার রুমমেট। আমার নাম লিলি।"
লিলি হাত বাড়িয়ে দিল। হাত মেলালাম।এবার তার পেছনে আরেকজন ছোটখাট যুবক এসে দাঁড়িয়েছে। সেও হাত বাড়িয়ে দিল। "মালেক।"
মালেক ছেলেটিকে দেখে খুব নিরীহ মনে হল। জিনিয়া হাত মেলানোর কোন চেষ্টা করল না। আমি হাতের ফুলগুলো বোকার মত ধরে রেখেছিলাম, হঠাৎ সেগুলোর দিকে নজর পড়তে ঝট করে বাড়িয়ে দিলাম জিনিয়ার দিকে। ফুলগুলো হাতে নিয়ে আবার ফিক করে মুচকি হাসল জিনিয়া। তার ঝকঝকে দাঁতের সারি ঝিলিক দিয়ে গেল। খুশী হয়েছে। যাক, একটা ফাড়া গেল। ঠিক কিভাবে কি করব আগে থেকে পরিকল্পনা করবার কোন উপায় ছিল না। ভেবেছিলাম হয়ত তার এপার্টমেন্টের ভেতরেই বসে কথা বলা যাবে কিন্তু লিলি জোর গলায় বলল, "কোথায় যাবেন ঠিক করেছেন? আমাদের এখান থেকে কাছেই ভালো রেস্টুরেন্ট আছে। জিনিয়াকে নিয়ে সেখানে চলে যান। গিয়ে বসে দু' জনে আলাপ করুন। কথা শেষ হলে আমার বান্ধবীকে এখানে ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন।"
মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। আমার গাড়ীতে ড্রাইভার ছাড়া আর কারো বসার কোন স্থান নেই। আমতা আমতা করে বললাম, "নিশ্চয়। তবে, আপনারাও আসুন না আমাদের সাথে।"
লিলি তিরিক্ষি গলায় বলল, "আরে, আপনি দেখি এখন আমার সাথে টাঙ্কি মারার চেষ্টা করছেন। আমি বিবাহিতা। মালেক আমার স্বামী। বুঝতে পারছেন?"
খুবই বিব্রতকর অবস্থা। ঘামতে শুরু করেছি। তোতলাতে তোতলাতে বললাম, "না মানে, গাড়ীতে প্যাসেঞ্জার বসার কোন জায়গা নেই। জিনিষ পত্রে ভর্তি।"
লিলি সন্দিহান দৃষ্টিতে আমাকে পর্যবেক্ষন করছে। জিনিয়া এবং মালেক নীরবে তাকিয়ে আছে। বুঝলাম, এই বাসায় লিলির মতামতের মূল্য অনেক। শেষে মাথা দোলাল লিলি। জিনিয়াকে নিয়ে আমার সাথে রেস্টুরেন্টে আসতে সে সম্মত হয়েছে। বাঁচা গেল। আবার বিপদও হল। মেয়েটি যেরকম মেজাজী এবং ঠোঁট কাঁটা তাতে সেখানে গিয়ে কি সমস্যা হয় কে বলতে পারে।
মালেককে অনুসরণ করে কাছেই এক ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসলাম আমরা। জিনিয়া আমার পাশেই বসেছে, মুখোমুখি বসেছে লিলি এবং মালেক। খুবই অস্বস্তিকর পরিবেশ। শুধু জিনিয়ার সাথে একাকী থাকলে যা

হোক কিছু একটা নিয়ে আলাপ করা যেত। কিন্তু সামনেই লিলি এবং তার স্বামী ড্যাব ড্যাব করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, এই পরিস্থিতিতে কথা বার্তা শূরু করাই মনে হল বিরাট সমস্যা। তবুও জিনিয়াকে তার ইউনিভার্সিটি, ক্লাশ এই জাতীয় ব্যাপার নিয়ে টুকটাক প্রশ্ন করলাম। সেও মনে হল না খুব একটা বাকপটু। খাবারের অর্ডার দিতে গিয়ে আরেক বিপদ। কেউ কিছুই খেতে চায় না। বাধ্য হয়ে শুধু চা কফির অর্ডার দিলাম। নীরবতা ভাঙার জন্য সামনেই বসে থাকা লিলিকেই বললাম, "আপনাদের ইউনিভার্সিটিটা খুব সুন্দর!"

লিলি ভ্রু কুঁচকে বিরক্ত দৃষ্টিতে আমাকে ভস্ম করার চেষ্টা করল। "দেখেন, আমার দিকে তাকিয়ে সুন্দর-সুন্দর করবেন না। আমি জানি আমি সুন্দর! ছেলেপেলেরা জ্বালিয়ে মারে। এই জন্য তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলেছি। আমার বান্ধবী পাশে বসে আছে। তাকে বলুন।"

আমি ঘাবড়ে গিয়ে মালেকের দিকে ফিরতে সে লজ্জায় মনে হল টেবিলের নীচে সেঁধিয়ে যাবে। জিনিয়া কথাবার্তা কম বললেও সপ্রতিভ। পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য দ্রুত বল্ল, "হ্যাঁ, আমি প্রথম যখন আসি তখন একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তুমি কোন স্কুলে পড়েছ?"

মেয়েটা মনে হয় ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশুনা করে থাকবে কারণ সে ইংরেজীতেই কথা বলছে। "মিশিগানের ওকল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে। অসম্ভব সুন্দর। প্রায়ই হরিণের পুরো পরিবার ক্যাম্পাসে এসে ঘোরাফেরা করত।"

লিলি রুক্ষ কণ্ঠে বলল, "ঐ স্কুলটা আবার কোথায়? জীবনে নাম শুনিনি।"

মালেক কিছু একটা বলতে গিয়ে ধমক খেল। আমি মৃদু গলায় বললাম, "তেমন নাম করা স্কুল নয়।"

বোধহয় দু মুহূর্ত বেশীক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম তার দিকে। ভ্রু কুঁচকে গেল। "এমন হাঁ করে তাকিয়ে আছেন কেন? বিবাহিত মহিলাদের সাথে টাঙ্কি মারতে খুব ভালো লাগে, না?"

মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। এই খানে আর কিছুক্ষন থাকলে লিলির হাতে চড় থাপ্পড় খেতে হতে পারে। ঘড়ি দেখে বললাম, "আমাকে যেতে হবে। অনেক দূর ড্রাইভ করব। আজ রাতের জন্য মোটেল ঠিক করে রেখেছি। সাউথ ডাকোটার র‍্যাপিড সিটিতে। প্রায় ছয়শ মাইল। আট নয় ঘন্টার ড্রাইভ।"

এদিকে রাস্তা ঘাট ফাঁকাই থাকে। আমার ধারণা ছয় ঘন্টায় সারা যাবে কিন্তু এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য ছয়কে বারো করতেও আপত্তি নেই।

জিনিয়া বাঁধা দিল না। বলল, "চলুন আপনাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।"
লিলি এবং মালেককে পেছনে রেখে আমার সাথে হেঁটে আমার গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল। "লিলির কথায় তুমি কিছু মনে কর না। লিলি ঐরকমই।"
লিলিরা অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরও আমি ফিসফিসিয়ে বললাম, "ও এতো সন্দেহ প্রবণ কেন?"
জিনিয়া ফিক করে হাসল। "মালেক আমার সাথে খুব প্রেম করতে চেয়েছিল। আমি সাড়া দেই নি। পরে লিলির সাথে ওর সম্পর্ক হয়। বিয়েও করে। কিন্তু সারাক্ষণ ওকে সন্দেহ করে। মেয়ে খুব ভালো। কিন্তু কাউকে বিশ্বাস করে না।"
"আর নিজেকে বিশ্ব সুন্দরী মনে করে," আমি তিক্ত গলায় বলেই ফেলি।
খিল খিল করে হাসল জিনিয়া। তার ধবধবে সাদা দাঁতের সারি বেরিয়ে এসে তাকে আরোও ছেলেমানুষ লাগছে। কিছু বলল না।
গাড়িতে ওঠার আগে হাত বাড়িয়ে দিলাম। ভাবলাম এখন হয়ত হাত মেলাবে। আমাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ এগিয়ে এসে আলতো করে আমাকে বন্ধুর মত জড়িয়ে ধরল জিনিয়া। "সাবধানে চালিয়ে যেও।"
আমি কিছু বললাম না। আলতো করে হাত নাড়লাম। দূরে লিলি আর মালেককে লক্ষ্য করেও হাত নেড়ে গাড়িতে উঠলাম। মালেক প্রত্যুত্তরে হাত নাড়ল। লিলি কোমরে দুই হাত দিয়ে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

র‍্যাপিড সিটিতে মোটেলে পৌঁছে কার্ড কিনে ফোন বুথ থেকে দেশে ফোন করলাম। মা খুব কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইল, "কেমন দেখলি?"
বললাম, "ছেলেমানুষ মা! অনেক ছোট।"
বাবা বললেন, "দেশে আয়।"
ছয় মাস পর দেশে ফিরে গিয়ে লতাকে দেখে হৃদয় উতলা হয়ে উঠল। কিন্তু সে অন্য কাহিণী, অন্য কোন দিনে।